ঝুমঝুমপুর রহস্য

ফারুক নওয়াজ

এম্প্রীতি প্রকাশ

উ | ৎ | স | র্গ

কাজী তানহা ফাতিমা তুলতুল
কাজী আছমাউল হুছনা তাশিন
বন্ধু-লেখক হাসান কামরুলের দুই কন্যারত্ন

আগে যা পড়তে হবে

আমার নাম তৌফিক নওয়াজ। ডাকনাম আদিত্য। আদিত্য অর্থ সূর্য। সূর্য আলোর উৎস। সূর্যের আলোয় পৃথিবী আলোকিত হয়। জীব জন্তু, গাছ-পালা সূর্যের আলোতে জীবন ফিরে পায়। আবার সূর্যের ঝাঁঝালো তাপে মাটি ফাটে, জলাশয় শুকোয়, মানুষের কষ্ট বাড়ে। তবে এটা সত্য যে, সূর্য-ই জীবনের উৎস। সূর্য না থাকলে কিছুই থাকত না। তাই আমার নাম এই সূর্যের নামে রাখা হয়েছে। আদিত্য আমার বাবার রাখা নাম।

খুব ছোটোবেলায় আমি খুব শান্ত ছিলাম। যত বড়ো হচ্ছি, ততই চঞ্চল হচ্ছি। দুষ্টুমি ছাড়া আমি একটুও থাকতে পারি না। এজন্যে, আমাকে মায়ের বকুনিও খেতে হয় খুব। কোথাও বেড়াতে গেলে মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে যান; সেখানে আমি যেন দুষ্টুমি না করি।

যদিও আমি সেই ওয়াদা রাখতে পারি না। আর আমার মেধার প্রশংসা সবাই করলেও, পড়াশোনার প্রতি আমার খুব অবহেলা। বরং পাঠ্যপুস্তকের চাইতে গল্প-ছড়া ও রূপকথার ওপর আমার বেশি আগ্রহ। আমার আর একটা শখ ছবি আঁকা। বিশেষকরে মানুষের মুখ, পাখি, ঘর এবং আকাশ ও নদী আঁকতে আমার ভালো লাগে।

আমার একটি বোন আছে। নাম তার অন্তরা। বয়স তিন বছর হয়নি। সে খুব মিষ্টি। কিন্তু আমার কাজের সময় খুব বিরক্ত করে। আমার ছবি আঁকার খাতাটা চুপিচুপি নিয়ে হিজিবিজি কীসব আঁকে। বলে, 'পাকিল বাছা। পাকিল ডিম।' ও শুধু পাখির বাসা আর ডিম আঁকতে পারে।

আমার বয়স খুব কম। বাবা এবং মা লেখালেখি করেন। মা আমাকে শাসন করলেও বাবা খুব ভোলো। তিনি তেমন বকেন না। বকলেও পরে আদর করেন।

আমাদের গ্রামের নাম মুজদিয়া। বিশাল পুরনো আমলের বাড়ি। এ বাড়িটি আগে অবশ্য এক জমিদারের পোড়োবাড়ি হিসেবে জনমনে আতঙ্কের কারণ ছিল। এই পোড়োবাড়ির

ধ্বংসাবশেষের ওপরই নির্মিত হয় আমাদের এই প্রাসাদটি। তাও প্রায় শতবছর আগে। দু'পাশে ঘন আরণ্য। সামনে নদী। বাড়ির সামনে চারটি খুব বড়ো ঝাউগাছ। একটু বাতাস বইলেই শনশন শব্দ হয়।

আমাদের পুরনো আমলের দোতলা প্রাসাদে প্রতিরাতে গা ছম-ছম করা ঘটনা ঘটে। গভীর রাতে মনে হয় ছাদে কারা ঘোড়া গাড়ি চালাচ্ছে। কখনো শোনা যায় নূপুরপায়ে নাচের শব্দ। কখনো হিহি হাসির আওয়াজ। আমাদের দো-নলা বন্দুক আছে। বাড়ির লোকজন বন্দুক তাক করে, টর্চ নিয়ে ছাদে গিয়েছে কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি একবারও।

তবে এমন হয় কেন?

এই এমন হয় কেন? —এ প্রশ্নের কোনো বাস্তবসম্মত জবাব কেউ দিতে পারে না। মানুষের মুখে-মুখে এই প্রাসাদ আর গ্রামকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অলৌকিক, ভৌতিক-অবিশ্বাস্য অসংখ্য কাহিনি।

এ কাহিনি অনেকেই বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি ছোটো হলেও ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। বাবা-মা সহ আমরা দু'ভাই-বোন ঢাকায় থাকি।

বছরে একবার গ্রামে আসি।

আমাদের গ্রামের আরেক নাম শান্তিপুর। একসময় নাকি এ-গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর ছিল। একগ্রামের এতো নাম? আর নামের এতো পরিবর্তনই বা কেন? ব্যাপারটা আমাকে ভাবায়।

গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর ॥ এক

বামনডাঙা থেকে উত্তরে সোজা পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে গেলেই বিলক্ষণ নগর। তার পুবদিকে অদৃষ্ট বিল। কালো বিড়ালের চোখের মতো মিশমিশে আঁধার রঙের পানি। চৈত্রমাসের জমিনফাটা রোদেও বিলের পানি শুকোয় না। প্রায় ৭ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে বিলের পরিধি।

'অদৃষ্ট বিল' নামকরণের সার্থকতা আছে। অমাবস্যার রাতে বিলের পাশ দিয়ে কোনো পথিক ভয়ে যাতায়াত করে না। এ

পর্যন্ত শ'খানেক পথিক নাকি অমাবস্যারাতে বিলপাড়ের পথ বেয়ে যেতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। যদিও এগুলো জনশ্রুতি। সত্তর বছরের কোনো বুড়োর কাছে শুনতে চাইলেও তিনি বলবেন, তাঁর বাবার মুখে শুনেছেন, তাঁর দাদার দূর-সম্পর্কের এক ভাই নাকি এই বিল পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন।

জন-মনিষ্যিরা বলে, ইচ্ছা করে কেউ অমানিশায় ওই বিলমুখে পা মাড়ায় না, যার অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা আছে সে-ই রাতবিরেতে ওদিকে পা বাড়ায়। ওই অদৃষ্ট বিলের পাড়ে দাঁড়ালেই উত্তরে সারি-সারি তালগাছ চোখে পড়বে। তালগাছের সারির ফাঁক দিয়ে মেঘরঙ ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা ঝুমঝুমপুর পোড়োবাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

ঝুমঝুমপুর। নাম শুনলেই গা ছম ছম করে ওঠে। রূপকথার অচিনপুরের কথা কে-না শুনেছে! সেখানে সোনার রাজবাড়ি আছে। সেখানে সোনার খাটে ঘুমিয়ে থাকে অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যে। রাজকন্যে রাক্ষসদের হাতে বন্দী। ওরা সবাইকে শেষ করে সুন্দর রাজকন্যেকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে। কন্যের পায়ের কাছে রুপোর কাঠি আর মাথার কাছে সোনার কাঠি। সে কাঠি উল্টে-পাল্টে দিলেই ঘুমন্ত রাজকন্যে জেগে ওঠে। সেই রূপকথার অচিনপুরের মতোই ঝুমঝুমপুর সম্পর্কেও গ্রামবাসীর মধ্যে বিভিন্ন উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে আতঙ্ক।

কিন্তু কেন এ আতঙ্ক? কী এমন ভয়-ভীতি ওদের মধ্যে কাজ করছে। ঝুমঝুমপুর ছাড়িয়ে আট-দশ-গ্রামব্যাপী এই গা-ছম ছম গল্পকথা লোকমুখে আলোচিত হয়।

দুপুরের পর থেকে ও-গ্রামে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায় না। শতাব্দীর স্মৃতি ধারণ করে ক্ষত-বিক্ষত জমিদার বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক দাঁড়িয়ে নয়, বলা যায়, ক্রাচে ভরকরা পঙ্গু লাঠিয়ালের মতো কয়েকটি থামের ওপর কোনো রকম টিকে আছে।

প্রতাপশালী জমিদার রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ। তার ভয়ে গাছের পাতা থির হয়ে থাকত। কুকুর ঘেউ ঘেউ ভুলে গাছতলায় ঝিমাত। গাভী ঘাস খেতে সাহস পেত না। পাখিরা গান ভুলে থাকত। আর মানুষ থর থর করে কাঁপত।

কিংবদন্তী আছে, এই জল্লাদ জমিদার রায়বাহাদুরের নির্দেশে শত শত গরিব নিরীহ প্রজাকে দিন-দুপুরে বাড়ির সামনের তেঁতুল গাছটিতে গলায় রশি লটকিয়ে হত্যা করা হতো।

ফসল হোক বা না হোক বিঘাপ্রতি পাঁচ মন ধান জমিদারের গোলায় তুলে দিয়ে আসতে হবে। খরায় ফসল না জন্মাক, বন্যায় জমি তলিয়ে যাক। মাফ নেই। ফসল চাই-ই!

জমিদারের ম্যানেজার ট্যারা রাশবিহারী আরো ভয়ানক। তার চোখে-মুখে শয়তানি ঝিলকে উঠত। ঘোড়ায় চড়ে সে প্রজাদের ঘরে ঘরে ফসল জমা দেবার ফরমান দিয়ে আসত। শুধু তাই-ই নয়, কার গোয়ালে ভালো গাভী আছে, কার গাছে

আতঙ্ক বেড়ে চলেছে ॥ তিন

দিন যতো যাচ্ছে ঝুমঝুমপুর রহস্য ততই ঘনীভূত হচ্ছে।

গভীর রাতে ওই পোড়াবাড়িতে রঙ-বেরঙের বাতি জ্বলে। মেলা বসে। এক ধরনের অদ্ভুত মানুষের ভিড় জমে ওঠে সেখানে। নাচে-গানে মত্ত হয় তারা।

বহুদূর থেকে সেসব রহস্যময় দৃশ্য দেখা যায়। ব্যাপারটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল সে-খবর। কিন্তু খবরটা কতটুকু সত্যি, সেটা কেউ তলিয়ে দেখে না।

সবার মুখেই এক কথা; ওখানে অনেক রাতে মেলা বসে। হইচইয়ে মেতে ওঠে অদ্ভুত মানুষেরা। তারা হাসে। গান গায়। হাত ধরে নাচে। মিহিকণ্ঠে অচিন ভাষায় তারা কী-সব আলাপ-আলোচনা করে। তাদের সবারই মাথায় মুকুট। সেই মুকুটে হীরে-মোতি চুনি-পান্নার কাজ। জ্বল জুল করে জুলে। মুকুটে গাঁথা ময়ূরের ঝিলিমিলি পাখনা। দূর থেকে মেয়ে-পুরুষ চেনা যায় না। সবার হাতেই চুড়ি-বালা। গলায় লকেটঅলা চেন। কানে ঝুমকা। তাদের তাণ্ডব দেখে আশপাশের সাতগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ঘরবাড়ি ফেলে-ছুড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। সারা এলাকায় হট্টগোল পড়ে যায়। সরকারি পর্যায়ে এই মহা-রহস্যের সুরাহা করার দাবিতে মানুষ দলবেঁধে মিছিল পর্যন্ত করেছে।

অবশেষে সরকার কিছুটা তৎপর হয়। বিশেষ তদন্ত টীম গঠন করা হলো।

ঝুমঝুমপুর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে তদন্ত ফাঁড়ি বসানো হলো। তদন্তকারীরা দিনের পর দিন দূর থেকে রহস্য আঁচ করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু কোনো রহস্যই তাদের কাছে ধরা পড়ে না।

কোনো আলো-টালো, নাচ-টাচ, হৈ হল্লা কিংবা অদ্ভুত মানুষ-টানুষ তারা দেখতে পান না। পোড়োবাড়ি অন্ধকারে ঢেকে থাকে।

ছয় বছর আগের একটি ঘটনা ॥ পাঁচ

এ রহস্যের শেষ কোথায়?

এ কোনো অশরীরী চক্রের কাজ নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে জলজ্যান্ত রহস্য। অতীতে এ-রহস্য উদঘাটনে বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

কিন্তু কেন?

এই কেনর উত্তর নেই।

মি. রমেলের মাথায় 'কেন' শব্দটা চক্কর দিতে থাকে। তার মগজের মাঠে এই প্রশ্নটি দ্রিম দ্রিম করে ড্রাম পেটাতে থাকে।

চিন্তিত হয়ে যান তিনি।

কোনো বিশেষ টেনশনে থাকলে তিনি বাঁ হাতের বুড়ো ও অনামিকা আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরে ডান পায়ের ওপর বাঁ পা তুলে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকেন। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা অনবরত নাড়ান। চোখ বন্ধ করে দু'পাটি দাঁতে খট খট শব্দ তোলেন। অনেকক্ষণ এভাবে থেকে পাইপে ডাচম্যান তামাক সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করে টানতে থাকেন।

এখন তার কপালে হাত নেই। বাঁ হাতটা ঘাড়ের পেছনে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপে সুখটান দিতে থাকেন।

অতীতে ফিরে যান মি. রমেল।

আজ থেকে ছ'বছর আগে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল।

নীলখৈ পাহাড়ের উত্তরে সিংহদ্বার গ্রামের ঘটনা।

বিভিন্নরকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানার খবর আসতে লাগল।

সন্ধ্যার পর থেকেই রহস্য জমে ওঠে।

হাট-ফেরতা গ্রামবাসীরা এর শিকার। সিংহদ্বার গ্রামের দু'পাশে ঘন বন। সেই বনের মধ্যে ওৎ পেতে বসে থাকে অলৌকিক প্রেতাত্মারা। তারা ধাওয়া করে হাটুরেদের। নিরীহ হাট-ফেরতা জন-মনিষ্যিরা সদাইপাতি ফেলে দৌড় দেয়।

অশরীরীদের হো... হে... হা... হা... বিকট কণ্ঠস্বরে প্রকম্পিত হয় সিংহদ্বার বনভূমি।

নতুন নাম শান্তিপুর ॥ বারো

আর মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা সময় হাতে আছে। অর্থাৎ পুরো দেড় দিন।

আবার মি. রমেল ঝুমঝুমপুর পোড়াবাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে। আটান্নজন সশস্ত্র সেপাইয়ের একটা দল। পূর্ব নির্দেশমতো সবাই বাড়িটার চারদিকে প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়ায়। বাকি একশ জন মি. রমেলের সঙ্গে পোডড়াবাড়িতে ঢোকে।

পোড়োবাড়ির মধ্যে শুরু হয়ে যায় অদ্ভুত সব ভূতুড়ে কাণ্ড

কারখানা। অশরীরী শব্দে সমস্ত বাড়ি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। রক্ত হিম করা সব বীভৎস শব্দ। হো হো হি হি হি কেরে কেরে কুরু করুরু ঝুম ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর রু রু রু রু বম্ ব ক্যাট ক্যাট দ্রিম দ্রিমা...।

ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব শব্দ। ওদিকে সোনার খড়ম, রুপোর বাঁশি, হীরের পাখি, মণি-মাণিক্যের প্রজাপতি মাছ ইত্যাদি ওদেরকে কাছে ডাকে- এসো বন্ধুরা, এসো। আমাদের গ্রহণ করো।

মি. রমেল সঙ্গীদের আবারো সতর্ক করে দেন—সাবধান ওদের আহ্বান আর প্রলোভনে মোটেও ধরা দেবে না।

এবার তিনি অশরীরী আত্মাদের উদ্দেশে বলেন- 'শতাব্দীর বন্দী বন্ধুরা, আমরা তোমাদের মুক্তির জন্যে এসেছি। তোমরা শান্ত হও। আমরা শুনেছি তোমাদের ইতিহাস। শুনেছি তোমাদের করুণ কিংবদন্তী।'

কথাগুলো জাদুর মতো ফলল। হঠাৎ সমস্ত পোড়োবাড়ি নিশ্চুপ হয়ে গেল। কোথাও কোনো টু-শব্দটি নেই। পলকেই সেই সোনার খড়ম, রুপোর বাঁশি ইত্যাদি লোভনীয় জিনিস অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথমে কক্ষের দক্ষিণের দেয়ালটা স্বপ্নের সোনালি চুলির বালকটির কথামতো ভাঙা হলো। সেই কঙ্কালটা পাওয়া গেল। জমিদারের হাতে নৃশংসভাবে নিহত ইনসাফ মোল্লার কংকাল এটা। কঙ্কালটার চক্ষুগহবরে জমে আছে একটা নির্যাতনের

জঘন্য ইতিহাস। এর পর অন্ধকার কক্ষের উত্তরে উঁচু টিলার দিকে এগিয়ে গেলেন মি. রমেল।

মি. রমেলের নির্দেশে সঙ্গী-সেপাইরা সুঠাম হাতে কোদাল, গাইতি চালাতে থাকে। সেখানে তারা যুগের সাক্ষী টিলার অভ্যন্তরে থেকে শত শত মানুষের হাড়-কঙ্ককাল টেনে তুলল। কঙ্কালগুলোর চেহারা আকার আকৃতি অভিন্ন। কে পুরুষ, কে বালক, কে নারী, কিংবা কে সুন্দর, কে কুৎসিত তা ঠাওর করা যায় না।

ইতোমধ্যে ঝুমঝুমপুরের আশপাশের সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করে। দেওয়া হলো–

ঝুমঝুমপুরের আতঙ্ক চিরদিনের জন্যে দূর হয়েছে। আর কোনো ভয় নেই। প্রেতাত্মারা আর কোনোদিনই কোনো উৎপাত করবে না। যারা বসতবাড়ি ফেলে ভয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন তারা এখন নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ভিটেই চলে আসুন।

একটি শত বছরের পরাধীন দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মতো আনন্দ উচ্ছ্বাস হৈ-হল্লা শুরু হলো। মি. রমেল যেন স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ। তাঁর উদাত্ত আহবানে এবং ঘোষণায় ঝুমঝুমপুর মুক্ত হয়েছে। শুধু আহবান বা ঘোষণাই নয় তিনি ঝুমঝুমপুর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক যেন।

মি. রমেলের ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

ঝুমঝুমপুরের আশপাশের গ্রামগুলোর বাসিন্দারা যারা পোড়াবাড়ির আতঙ্কে সর্বক্ষণ নিমজ্জিত ছিল তারা সেই ঘোষণা শুনে রাস্তায় নেমে এলো।

মেয়ে-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ সবাই ঘর থেকে নেমে পড়ল পথে। সবার চোখেমুখে সব পেয়েছির আনন্দ। তাদের বুক থেকে যেন বহুদিনের চেপে থাকা জগদ্দল পাথরটা মুহূর্তেই সরে গেল।

তারা এখন মুক্ত। স্বাধীন পায়রার মতো ডানা মেলে উড়তে চায় ঝুমঝুমপুরের আকাশে। সারিবদ্ধ পিঁপড়ের মতো তারা পিলপিল করে আতঙ্কিত পোড়োবাড়ির কাছে আসতে শুরু করল। দলে-দলে মানুষের ভিড় জমতে থাকে ঝুমঝুমপুর জমিদারবাড়ির কাছে। চোখ মেলে তারা দ্যাখে অত্যাচারী জমিদারের হাতে নিহত শত শত মানুষের কঙ্কাল হাড়গোড়।

গ্রামের মধ্যে একটা জায়গা নির্বাচন করে পবিত্রতার সঙ্গে সেই কংকালগুলোকে কবরস্থ করা হলো। কবরস্থানটা ঘিরে দিয়ে চারিদিকে লাগিয়ে দেওয়া হলো অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়ায় চারা।

মি. রমেল উপস্থিত জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন

‘বন্ধুরা জমিদার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথের সীমাহীন অত্যাচারের শিকার হয়েছিল এ-অঞ্চলের নিরীহ চাষি-প্রজারা। অত্যাচারী জমিদার এবং তার কুচক্রী ম্যানেজার রাশবিহারীর নির্দেশে পোষা জল্লাদের অস্ত্রাঘাতে হাজারো গরিব চাষির